Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১ সেপ্টেম্বর, ২০২০

৪৩ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৩১ আগস্ট, ২০২০, সোমবার, ১৪ ভাদ্র, ১৪২৭

খাদ্য আন্দোলনের শহিদ স্মরণে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ আগস্ট : খাদ্য আন্দোলনের শহিদ স্মরণে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানে সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা দপ্তরে। শিবির আয়োজন করেছিল সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটি। শিবিরের উদ্বোধন করেন দলের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। উপস্থিত ছিলেন অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, আভাস রায়চৌধুরী, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, তরুণ রায় প্রমুখ। শিবিরে মোট ৬০ জন রক্তদান করেন।

সিআইটিইউ স্মরণ করল শ্যামল চক্রবর্তী ও বিদ্যুৎবরণ ভক্তকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ আগস্ট, বর্ধমান : সিআইটিইউ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ শ্যামল চক্রবর্তী এবং পূর্ববর্ধমান জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য এবং দাঁইহাট পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিদ্যুৎবরণ ভক্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণসভা হল জেলা সিপিআই(এম) অফিসে। স্মরণসভার শুরুতেই শ্যামল চক্রবর্তী ও বিদ্যুৎবরণ ভক্তের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন সিআইটিইউ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি অঞ্জন চ্যাটার্জী, সিআইটিইউ পূর্ব বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত কোঙার, রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতা আভাস রায়চৌধুরী, গণআন্দোলনের নেতৃত্ব অচিন্ত্য মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই দুই প্রয়াতের স্মৃতিচারণা করেন সিআইটিইউ পূর্ব বর্ধমান জেলার অঞ্জন চ্যাটার্জী এবং সুকান্ত কোঙার। এই স্মরণসভায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রায় ২০০ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবাদে বর্ধমান জেলার মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ আগস্ট : সারাভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়েছে বর্ধমান জেলা জুড়ে। মনরেগার পরিধি বাড়িয়ে গ্রাম ও শহরে সর্বত্র ন্যূনতম ২০০ দিন কাজের গ্যারান্টি ও মজুরি বৃদ্ধি, বেকারদের কাজ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ ও সুদ মুকুব, সবাইকে ১০ কেজি খাদ্যশস্য অন্তত ছয় মাস দেওয়ার দাবি ছিল উল্লেখযোগ্য। এদিন বর্ধমান শহরে ১

—এরপর চারের পাতায়

খাদ্য আন্দোলনের শহিদ দিবস পালিত হল জেলা জুড়ে

কেতুগ্রাম থানার শিবলুন গ্রামে শহিদ স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ আগস্ট : খাদ্য আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মরণ করা হল গোটা রাজ্য জুড়ে। ১৯৫৯ সালের খাদ্যের দাবিতে মিছিলের উপর লাঠিপেটা করে ৮০ জনের প্রাণ নিয়েছিল বিধানচন্দ্র রায় সরকারের পুলিশ। সেই দিনটিকে স্মরণ করেন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা। এদিন লকডাউনের কারণে কেন্দ্রীয়ভাবে বড় কর্মসূচি না হলেও পাড়ায় পাড়ায় শহিদ দিবস পালিত হয়েছে। পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি পালিত হয়েছে বর্ধমান শহরে দুটি এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন শাখা স্তরে।

শহিদ দিবস পালন করলেন কালনা শহরে বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীরা। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, জনা পাল, স্বপন ব্যানার্জী প্রমুখ। এদিন তাঁরা কালনা পৌরসভার ৭, ১৩ এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে জীবাণুনাশক স্প্রে করেন। তার আগে ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনে বীর শহিদদের স্মরণে বিভিন্ন স্থানে পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। কালনা শহর ৭নং ওয়ার্ড জিউধারা কোয়ার্টারের সামনে পতাকা উত্তোলন করেন এলাকার ৯৯ বছর বয়সী পার্টি দরদী সুধীর হালদার। যুবনেতা নেপাল সরকার ও অরিজিৎ রায় জানান, খাদ্যের দাবিতে খাদ্যআন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ৩১ আগস্ট ১৯৫৯ সালে। সেই সময় রাজ্য জুড়ে তীব্র খাদ্য সংকটের ফলে রাজ্যের গরিব সাধারণ মানুষের খাদ্যাভাবে দিন কাটতো। খাদ্যের দাবিতে রাজ্য জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল বামপন্থীরা। সেই ঐতিহাসিক দিনটি আজও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু আজ লকডাউনের কারণে সেই ঐতিহাসিক দিনটির তাৎপর্য কি তা মানুষের সামনে বোঝানোর কোনো সুযোগ নেই। তাই পরিবর্তিত কর্মসূচি হিসেবে আমরা এলাকায় এলাকায় জীবাণুনাশক স্প্রে করার কর্মসূচি পালন করলাম।

সপ্তাহব্যাহী প্রচার কর্মসূচি পালিত জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা ৩০ আগস্ট : সপ্তাহব্যাপী দেশ জোড়া প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘিরে পূর্ব বর্ধমান জেলার গ্রাম বাংলা এখন উত্তাল হয়ে উঠেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বর্ধমান শহরে ২৬ আগস্ট সিপিআই(এম) শহর-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কার্জনগেটের সামনে প্রতিবাদকর্মসূচি পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, নজরুল ইসলাম ও সুপর্ণা ব্যানার্জী প্রমুখ। প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সিপিআই(এম) নেতা ও কর্মীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে টোটো ভাড়া করে তাতে মাইক লাগিয়ে গঞ্জের বাজারে, হাটতলায়, গ্রামের মোড়ে মোড়ে এই দুই সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতনভাবে এগিয়ে

আসার আহ্বান জানাচ্ছেন। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যায় মানুষ যখন দিশাহারা হয়ে পড়েছেন এই লকডাউন সময়ে তখন গরিব অসহায় মানুষদের কথা না ভেবে দিদি আর মোদী নিজেদের মধ্যে বোল কাটাকাটি শুরু করে দিয়ে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। হাতে নগদ অর্থ তুলে না দিয়ে শ্রমজীবী মানুষদের আরো দুর্দশার মুখে ঠেলে দিচ্ছে এই দুই সরকার। গ্রামে গ্রামে বর্ধিত বেতন দিয়ে ১০০ দিনের কাজ ২০০ দিন করার দাবি তোলা হচ্ছে এই প্রচার গাড়িতে যাতে গ্রামের কাজহারা গরিব মানুষেরা দুবেলা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ভরপেট খেয়ে বেঁচে থাকতে পারেন। আজ সকাল থেকে দুপুর ভাদা, করুঞ্জি, কয়রাপুর হাটতলা এবং মুসলিম পাড়ায় কৃষক নেতা রবীন টুডু, খেতমজুর নেতা রবীন্দ্রনাথ দাস-এর নেতৃত্বে এই প্রচার কর্মসূচিকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে। সারাদিনব্যাপী জোরদার প্রচার চলে দিগনগর, ভেদিয়া, পিচকুরি, ভেরেণ্ডা, রামনগর, আউসগ্রাম, এরাল ভালকি, কোটা, দেবশালা প্রভৃতি এলাকাগুলিতেও।

নতুন চিঠি

পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী ও গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

আপনাদের প্রিয় 'নতুন চিঠি' তীব্র আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। দুঃসময়ের মধ্যেও পত্রিকা প্রকাশকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াস জারি রেখেছি আমরা। বিজ্ঞাপনবাবদ কোনো আয় নেই অথচ প্রকাশনার খরচ ক্রমবর্ধমান। এই অবস্থায় গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আবেদন—যাঁদের গ্রাহক চাঁদা বাকি রয়েছে তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা পরিশোধ করে পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করুন। সাপ্তাহিক 'নতুন চিঠি'-র বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদা ছাড়াও 'নতুন চিঠি'-কে যে-কোনো পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে পারেন পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে।

BANK DETAILS
Name of A/c : NATUN CHITHI
A/c No. : 10212634603
STATE BANK OF INDIA
Burdwan University Branch
IFSC Code : SBIN0002033

অশোক ব্যানার্জীকে স্মরণ : বিশেষ সংখ্যা নতুন চিঠি

নতুন চিঠির প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর স্মরণে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। লিখেছেন— বিমান বসু, মদন ঘোষ, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, আভাস রায়চৌধুরী, জহর মুখার্জী, মৃদুল সেন, সাইদুল হক, তাঁর দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সচিব জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী সহ প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বন্ধু ও আত্মজনেরা।

নদী ভাঙন রোধের কাজ শুরু হলেও অখুশি এলাকাবাসী

নিজস্ব সংবাদবাদা, পূর্বস্থলী, ৩১ আগস্ট : কয়েকদিন হল পূর্বস্থলী এক নম্বর ব্লকের জালুইডাঙার ভাগীরথী নদী ভাঙন রোধ-এর কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের বরাদ্দ করা ৪২ লক্ষ টাকা দিয়ে ফেলা হচ্ছে বাঁশের খাঁচা ও বালির বস্তা। এই কাজ দেখে খুশি নয় এলাকার বাসিন্দারা। নদী ভাঙনের চির অভিজ্ঞতা থেকে বাসিন্দারা বলছেন, এক বছরের মধ্যেই সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। আবার পরের বছর যে ভাঙন ছিল তা অব্যাহতই রয়ে যাবে। কি লাভ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা জলে ফেলে? প্রশ্ন এলাকাবাসীদের। উল্লেখ্য ব্যাণ্ডেল রেললাইনের নবদ্বীপ ও সমুদ্রগড় রেল স্টেশনের মাঝে জালুইডাঙ্গা গ্রামে কিছুদিন আগে ব্যাপক নদীভাঙন দেখা

দেয়। পাড় ভাঙতে ভাঙতে রেল লাইনের থেকে নদী মাত্র ২০ মিটারের দূরে চলে আসে। রেললাইন নদীগর্ভে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। ফলে দক্ষিণবঙ্গের সাথে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। শুধু রেলই নয়, স্থানীয় শ্মশানে যাওয়ার ঢালাই রাস্তাটি ভাঙতে শুরু করে। তাই দ্রুত এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি ওঠে। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের বাঁশের খাঁচা ও বালির বস্তা ফেলা শুরু করে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি বাঁশের খাঁচা ও বালির বস্তা দিয়ে ভাঙন প্রতিরোধ করা যাবে না। তাদের দাবি যে সঠিক, এই স্থান থেকে কিছুটা দূরে কালিনগরের ভাঙনের অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণ দিচ্ছে। কালিনগর গ্রামে বালির বস্তা দিয়ে নদীপাড় বাঁধাইয়ের কাজ করা হয় গত জুলাই মাসে। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই আবার নদী ভাঙন শুরু হয় এই গ্রামে। কালনা এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কালিনগর গ্রামে ইতিপূর্বেও পাকাপাকিভাবে ভাঙন সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়নি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। পাকাপাকিভাবে ভাঙনের সমস্যা সমাধান না করে লোক হাসানো কিছু প্রকল্প নেওয়া হয়। ভাঙন প্রতিরোধে একবার ভেটিভার নামক ঘাস লাগিয়ে দেওয়া হয় নদীর পাড়ে। বলা হয় এই ঘাসই নদী ভাঙন প্রতিরোধ করবে। কিন্তু যে বছর ঘাস লাগানো হয়, সেই বছরই সেই ঘাস ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। তারপর নদী ভাঙন প্রতিরোধে ফেলা হয় বাঁশের খাঁচা। সেই বাঁশের খাঁচাও ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায় এক বছরের মধ্যে। তারপরে গত জুলাই মাসে বালির বস্তা দিয়ে নদীপার বাঁধানো হয়। কিন্তু ভাঙন আজও অব্যাহত কালীনগরে। তাই জালুইডাঙ্গায় নদীভাঙনের ভবিতব্য

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৩১ আগস্ট, ২০২০

মোদী সরকারের পাশেই দাঁড়ালো সুপ্রিম কোর্ট

আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ জেইই মেইন, ১৩ সেপ্টেম্বর নিট এবং ২৭ সেপ্টেম্বর জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষার দিন ঘোষিত হয়েছে। শারীরিক উপস্থিতিতে এই পরীক্ষায় সংক্রমণের নানারকমের ঝুঁকি থেকে যাবে বলে জেইই এবং নিট পরীক্ষা বিভিন্ন শহরে হবে কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষার (কম্পিউটার বেসড টেস্ট, সিবিটি) রীতিতে। এ ধরনের পরীক্ষাকেন্দ্র দেশে খুব বেশি নেই।

প্রায় ৯ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী জেইই-তে বসবেন। সমান সংখ্যায় বসবেন নিট সহ অন্যান্য এন্ট্রান্স পরীক্ষায়। ফলে বহু ছাত্রছাত্রীকেই আসতে হবে দূর দূরান্ত থেকে নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে। তাদের অনেকেই হয়তো আসবেন রেড জোন বা চরম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে।

কোভিট 'পজিটিভ' হয়নি অথবা করোনার কোনও লক্ষণের মুখোমুখি হয়নি এমন সংশাপত্র আনতে হবে ছাত্রদের। আবার এখন যারা ভাইরাসে আক্রান্ত তারা কী করবে! তাদের জন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা হবে কিনা তাও বলা হয়নি।

এই অবস্থায় ছাত্ররা তো বটেই, শিক্ষক মহলেরও বক্তব্য বর্তমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষা নেওয়াটা হবে ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক অনড়। পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য গত সপ্তাহে বিভিন্ন রাজ্যের বেশকিছু ছাত্র দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু যথারীতি মোদী সরকারের অবস্থানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ছাত্রদের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় এস.এফ.আই সহ দেশের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর আহ্বানে বিরোধী দলগুলির সাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকেও ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। সেখানে পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার পক্ষে সকলে মত দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে রাজ্যগুলির একযোগে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার বিষয়েও মত প্রকাশ করেছেন উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীরা।

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যেহেতু এই পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা, তাই দ্রুততার সঙ্গে এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে সকলে ঐক্যমত হয়েছেন বলে প্রকাশ। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত মামলার শুনানির তালিকায় নিট-জয়েন্ট স্থগিত করার আর্জি জানানো ৭টি রাজ্যের 'রিভিউ' আবেদন আজকের তালিকায় নেই। বোঝা গেল দেশের সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থা কেন্দ্রের মোদী সরকারের পাশেই দাঁড়ালো।

আউসগ্রামে সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২৪ আগস্ট : কাজহারা গরিব মানুষকে মাসে ১০ কেজি খাদ্যশস্য আগামী ছয় মাস, প্রতিটি পরিবারকে সাড়ে সাত হাজার টাকা করে দেওয়া, কোভিড স্বাস্থ্যব্যবস্থার আরো উন্নতি, দেশের লাভজনক সংস্থাকে বিক্রি অথবা বেসরকারিকরণ না করা প্রভৃতি ১৬ দফা দাবির সমর্থনে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশজোড়া সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে গুসকরা শহরের ৬ এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিপুর কলোনি এবং ন-পুকুরপাড়ের আদিবাসী পাড়ায় পথসভায় সামিল হলেন এলাকার মানুষ। দাবিগুলির সমর্থনে মানুষকে আরও সচেতন করার লক্ষে পথসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন জেলা নেতা দীপঙ্কর দে, সুব্রত মজুমদার, প্রশান্ত কর্মকার, এরফান শেখ প্রমুখ। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে করোনাবিধি মেনে গত দুদিন ধরে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে ধাড়াপাড়া আদিবাসী পাড়ায় এবং কমলনগর, দোনাইপুর কলোনি, নদীপার সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায়। প্রতিটি এলাকাতেই গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের সমর্থনে এই কর্মসূচিকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

গুসকরায় প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা ২৯ আগস্ট : আর.এস.এস পরিচালিত দেশের সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গুসকরায় ব্যাপক প্রচার সংগটিত করল সিপিআই(এম) গুসকরা পূর্ব এরিয়া কমিটি। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৮ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে সচেতন থাকার লক্ষ্যে স্কোয়াড ও মোড়ে মোড়ে, গরিব পাড়ার ভিতর পথসভার মধ্য দিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানালেন সিপিআই(এম) নেতা এরফান শেখ, সুব্রত মজুমদার, প্রশান্ত কর্মকার প্রমুখেরা।

রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৬ আগস্ট : কালনা-২ ভলান্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত রাম গোস্বামীর স্মরণে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৯৭ জন রক্ত দান করেন। উপস্থিত ছিলেন কালনার মহকুমার শাসক সৌরভ মোহান্তি, বিডিও মিলন দেবঘড়িয়া প্রমুখ। প্রয়াত রাম গোস্বামী এলাকায় জনপ্রিয় শিক্ষক ও সমাজসেবী ছিলেন।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন বনাম শ্রেণিগত ঐক্য

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি দ্বারা গঠিত করসেবক বাহিনী ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করে। অভিযোগ, রাম-মন্দির ভেঙে তৈরি হয়েছিল এই মসজিদ। এর পর একের পর এক হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সুদীর্ঘকাল বিচারাধীন থাকার পর অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট এক মীমাংসাসূত্রে পরিস্থিতিকে সাময়িক নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেও তা সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটাতে পারেনি। কেননা যে হিন্দুত্ববাদী শক্তি কার্যত রামমন্দিরের উপর তার অপ্রত্যক্ষ দখল বজায় রেখেছিল, কেন্দ্রে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর সেই শক্তিই দেশব্যাপী করোনা মহামারির ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে কার্যত তাকে সুযোগ হিসাবে কাজে লাগিয়ে এ-বছর ৫ আগস্ট মহা উৎসাহে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রামমন্দিরের শিলান্যাস সম্পন্ন করলো। মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হলো যাগ-যজ্ঞ, গোমূত্র পান ইত্যাদি। করোনা-প্রতিরোধেও অনুষ্ঠিত হলো যজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রীর মুখে মাস্ক থাকলেও পুজারত প্রধান পুরোহিতের মুখ ছিল উন্মুক্ত। যজ্ঞ সমাপ্ত করার পর তিনি নিজেই করোনায় আক্রান্ত হলেন, আক্রান্ত হলেন রামমন্দির ট্রাস্টের প্রধানও। অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ১৪ জন পুলিশও করোনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন না। সবই রামের ইচ্ছা, হিন্দুধর্মে তিনি তো ঈশ্বরেরই সাকার রূপ।

ধর্ম হলো মানবসমাজ সহ সমগ্র বস্তুজগত এবং ব্যক্তি-মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও চেতনার উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণকারী এক অতিলৌকিক শক্তি তথা ঈশ্বরে বিশ্বাস। বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বরকে নিরাকার কিংবা সাকার রূপে কল্পনা করেছে। সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছে সেই ঈশ্বর সম্পর্কে ভয় ও ভক্তি, তাঁর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য পূজা-উপাসনা ও নানা আচার-অনুষ্ঠান; পাপ-পুণ্য, পরলোক, পূনর্জন্ম ইত্যাকার ধারণা, পবিত্র প্রতীক, এবং পুরোহিততন্ত্র। ধর্মবিশ্বাস এবং নিজধর্ম ও পরধর্ম সম্পর্কে সাধারণ চেতনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ধর্মচেতনা যখন ধর্মে সংবদ্ধ একটি সংকীর্ণ ও আবেগময় গোষ্ঠীচেতনায় পরিণত হয়, তখন তার কাছে ধর্মীয় পরিচয় মানুষের অন্যতম পরিচয় নয়, একমাত্র মৌল পরিচয় হয়ে ওঠে। ধর্মের এই মৌলবাদী নির্দেশনায়ই ধর্মীয় গোষ্ঠীচেতনা সাম্প্রদায়িকতার আবেগময় রূপ পরিগ্রহ করে ধর্মকেই জনবিভাজনের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করে। ধর্মের নামে তার প্রকৃত লক্ষ্য হয়ে ওঠে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ধর্মাতিরিক্ত তথা পার্থিব স্বার্থ-সাধনের জন্য পর-সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও প্রয়োজনে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া। তাই উপাসনাস্থলে নয়, রাজনীতি ও রাষ্ট্রের অলিন্দে অলিন্দেই এই তথাকথিত ধার্মিকদের অতি-তৎপরতা, কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতার সহায়তা ও মধ্যস্থতা ভিন্ন পার্থিব আনুকূল্য অর্জন সম্ভব নয়। রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ গাঁটছড়া তাই সাম্প্রদায়িকতার মৌলিক চরিত্রলক্ষণ।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সমগ্র ধর্মসমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের সক্রিয় অগ্রবাহিনী হলেও নাগরিক সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক চেতনা সুপ্ত বা অক্রিয় অবস্থায় থাকে, তাকে জাগিয়ে তুলে নাগরিক সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতাকে ক্রমপ্রসারিত করার লক্ষ্যে সমাজ ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে সর্ত-অর্ধসত্য-মিথ্যার জাল বুনে এবং সস্তা ও চটকদার শ্লোগানে সুকৌশলে সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটানো হয়। ইতিহাস মানুষের সত্তাবোধ তৈরি করে। তাই অতীতের মধ্যেই এই মতবাদের যথার্থতার উপাদান আছে একথা প্রমাণের জন্য তারা ইতিহাসকে যথেচ্ছ বিকৃত করে, মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে। অতীতের কল্পিত গৌরবের আলোকে তারা বর্তমানের পুনর্জাগরণ ও ভবিষ্যতের পথ নিরূপণ করতে চায়। শাসনক্ষমতায় আসীন হলে তারা পুলিশ, প্রশাসন ও মিলিটারি সহ সমগ্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটায়। এইভাবেই সাম্প্রদায়িকতা একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ হিসাবে গড়ে ওঠে।

প্রকৃত ধর্মে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ ধর্মের সঙ্গে ধর্মতন্ত্র তথা সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য নির্দেশ করে বলেছিলেন, যখন ধর্মের স্থান নেয় 'ধর্মতন্ত্র', তখন ধর্মচেতনা পরিণত হয় 'ধর্মমোহ' বা

'ধর্মপীড়া'য় এবং ধার্মিকের ভেকধারী 'ধর্মব্যবসায়ী'রা ধর্মকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে। তার 'ধর্মাতিশয্য' প্রকৃতপক্ষে 'ধর্মহীন'। 'ধর্মতন্ত্রের নিদারুণ অধার্মিকতা' ধর্মের গণ্ডিরক্ষাকেই ধর্মরক্ষা বলে জ্ঞান করে এবং এমন এক সম্মোহনের সৃষ্টি করে যাতে দেশলুব্ধগণ যেভাবে দেশজয়ে বের হয়, সেইভাবেই ধর্মতান্ত্রিক তথা সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্মসমাজের ধ্বজা নিয়ে বের হয় এবং বুশম্যান-সুলভ বর্বরতায় পরকে দেখবামত্র তাকে নির্বিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে। রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'যে দেশ প্রধানতঃ ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোন বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারেনা, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনাশা বিভেদ।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩/৩৬৩) কেননা 'ধর্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেলাবার দরজায় ভিতর থেকে আগল দেওয়া।' (ঐ ১৩/৩১২) 'ধর্মমোহ' কবিতায় বিপুল ক্ষোভে তিনি বলে উঠেছেন : 'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে / অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে। / বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে / নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে, / পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা, / দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।' প্রকৃত ধর্মের উপাসক বিবেকানন্দও খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "আমাদের দেশে দুটি শব্দ আছে! শব্দদুটি হইল 'ধর্ম' ও 'সম্প্রদায়'। আমাদের মতে ধর্মগুলি ধর্মমতের মধ্যেই অনুস্যূত। অপর শব্দটি—'সম্প্রদায়', তাহার অর্থ একটি সমমত-সমর্থক সখ্যবদ্ধ ব্যক্তির দল, যাঁরা নিজদিগকে ধার্মিকতার আচরণে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া বলিতে থাকেন, 'আমাদের পথই ঠিক, তোমরা ভুল পথে চলিতেছ'।" এদের কুয়োর ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেছেন, "সম্প্রদায়গুলিরও এই একই পন্থা। তাহাদের নিজেদের মতে যাহারা বিশ্বাস করেনা, তাহাদিগকে তাহারা দূর করিয়া দিতে এবং পদদলিত করিতে চায়।" (বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ১০/২৪-২৫)

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বিশেষ ধর্মের আদিপ্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্যে, তাকে লোভ দ্বেষ অহংকার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে, উপদেশ দিয়েছিলেন। তার পরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সংকীর্ণ করেছে; সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয়; মেরেছে প্রাণে মনে বুদ্ধিতে শক্তিতে, মানুষের মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার করেছে।১৩/৩৬৩" বিবেকানন্দও প্রায় একই সুরে বলেছিলেন, "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলোর ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এইসকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত।" ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় প্রদত্ত ভাষণে বিবেকানন্দের এই বক্তব্য আজও কত প্রাসঙ্গিক তা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি।

সাম্প্রদায়িক অবস্থান স্বভাবতই শ্রেণিগত অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রেণি হল মূলত একই অর্থনৈতিক অবস্থানভুক্ত একটি অর্থনৈতিক বর্গ। শ্রেণিগত সম্পর্ক উল্লম্ব অর্থাৎ স্তরবিন্যাস্ত উপর-নিচ সম্পর্ক। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই সম্পর্ক চূড়ান্ত বিচারে শোষক-শোষিতের বৈর সম্পর্ক। অপরপক্ষে সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব শ্রেণিগত দ্বন্দ্বকে আড়াআড়িভাবে কেটে সম্প্রদায়গত ঐক্য ও স্বার্থকেই চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য করে এবং সম্প্রদায়গত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। শাসক-শোষকের ধর্ম আর আমার ধর্ম এক হলেই শাসন-শোষণ মনোরম হয় না। তাছাড়া ধর্মীয় রাষ্ট্র অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে সঙ্গে এক ধর্মের উপর আর-এক ধর্মের, এবং একই ধর্মের একাংশের উপর আর-এক অংশের শোষণ কায়েম করে সমাজ ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রকে গ্রাস করতে পারে।

বিশ্বায়ন (Globalisation) তথা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিশ্বজয়ের অভিযান তার পথকে নিরংকুশ করার জন্য শ্রেণি-বিধ্বংসী ক্ষুদ্র আনুগত্য ও সেই সঙ্গে অন্ধ ভোগবাদেরও বিশ্বায়ন ঘটাচ্ছে। উত্তর-আধুনিকতাবাদ (post-modernism) ও উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ (post-colonialism)-এর মতো তত্ত্বগুলি শ্রেণির ধারণার মতো সকল প্রকারের তথাকথিত 'বৃহৎ বাচন' (grand narrative)-কে নাকচ করে মানুষের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীসত্তা (identity) ও তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার ধারণাগুলি বৈধ তত্ত্বের মর্যাদা পেয়ে যায়। ভারতের উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদী লেখকরা

—এরপর চারের পাতায়

কার নিকোবর দর্শন : ফ্যানি পার্কস

সঞ্জীব চক্রবর্তী

ফ্যানি পার্কস (১৭৯৪-১৮৭৫) ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক আমলার স্ত্রী। স্বামীর সঙ্গে ভারতে আসেন ১৮২২ সালে। এদেশ সম্পর্কে অসীম আগ্রহ ছিল তাঁর। ২৪ বৎসর ভারতে থাকার অভিজ্ঞতা ধরা আছে তাঁর স্মৃতিকথায়। ১৮২২ সালের অক্টোবর মাসে ফ্যানি কলকাতায় এসে পৌঁছচ্ছেন, পালতোলা জাহাজ বাতাস পড়ে যাওয়ায় নিশ্চল হয়ে গেছে কার নিকোবরের

কাছে। সে সময়ে এক অজানা দেশের স্থানীয় অধিবাসীদের দেখার সুযোগ হয় ফ্যানির। তারই কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা হল।

□

দ্বীপটির উপকূলের বালুকাবেলা অবধি সুন্দর গাছে ঢাকা; জাহাজ থেকে গ্রামটিকে দেখা যাচ্ছিল। শীঘ্রই নেটিভ লোকজন ভরা ক্যানোর দল আমাদের জাহাজ ঘিরে ফেলল; দুজন উঠে এল জাহাজে। লেডিরা তাদের আদমের পোষাকে দেখে সংকোচে সরে গেলেন। ক্যানো ভর্তি লাইম, সিমট্রন, অরেঞ্জ, নারকোল, কলা, ইয়াম, ডিম, মুরগি, শূকরছানা, আরো নানা রকম ফল। সংকোচ গৌণ হয়ে গেল লোভনীয় জিনিস দেখে। পোর্ট অংশে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে দর কষাকষি চলতে লাগল। বিনিময় হল এইভাবে—আমি একটা খালি জ্যামপট তুলে ধরলাম, বদলে পেলাম এক ঝুড়ি সিট্রন; দুটো খালি শিশির বদলে দুটো পাখি; আরো দুটি পাখি এল একটা খালি স্যুপের টিনের বদলে; একটা শুয়োরের ছানার দাম ছয় পেনি বা একটা পুরনো ক্ষুর। গোটা দরাদরিটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। ল্যান্সারদের মধ্যে প্রাইভেটদের খুব মওকা। আমি জানালার পর্দা থেকে দুটো পেতলের রিং কেটে নিলাম—পেতলের রিং পাওয়ার জন্য বিপুল চ্যাচামেচি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। একজন আংটি করে পরে নিয়ে বাকিগুলো ফেরৎ দিয়ে দিল, বদলে দিল অজস্র ফল। এক ল্যান্সার অফিসারের জ্যাকেটের একটা রংচটা বোতামের বদলে এল এক ঝুড়ি শঙ্খ।

কার নিকবরিটির কোমর থেকে হাঁটু অবধি খড়ের বুনট, গলায় নারকোলের দড়ি বাধা তিনটে বোতাম ঝুলছে। তার সৌন্দর্য ও অভিনবত্ব দেখে সবাই উচ্ছ্বসিত।

লোকগুলোর কোমরে একফালি রুমাল। কিছু লোকের মাথায় নারকোল পাতার ফালি। সর্দারদের গলায় পাক খাওয়ানো রুপোর তার বা কড়ির নেকলেস।

ডিনারের পর ঠিক হল যে সন্ধ্যায় ঠাণ্ডায় তীরে নামবো। আমি স্যাভেড আইল্যান্ডে মেয়েদের দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। তীরে নামা মাত্র মেয়েরা কোলাহল করতে করতে এসে ঘিরে ধরল। এই আমার বনেট ধরে টানছে তারপর আমার কালো সিল্কের অ্যাপ্রন হাতে তুলে নিয়ে খুব তারিফ করছে। কয়েকটা ইংরেজি কথা জানে; হ্যান্ডশেকও করল। মুখে বলতে লাগল—হাউ ডু, হাউ ডু? অ্যাপ্রনটা খুব কেনার ইচ্ছে; ধরে বারবার জিজ্ঞেসা করছে—ইউ বাই, ইউ বাই?

নেটিভরা খর্বকায়। মুখ কুরূপ, কিন্তু হাসিখুশিতে ভরা। শরীরের গঠন সুন্দর, ঠিক যেন প্রাচীন মূর্তির মতো। সটান হয়ে হাঁটে। নারীদের কোমরে হাঁটু অবধি নেমে আসা বস্ত্রখণ্ড জড়ানো। ওই একই অলংকার। চুল ও গায়ে নারকোল তেল মেখে চকচকে হতে থাকে, গন্ধ অপ্রীতিকর; কুঁড়েগুলো শক্তপোক্ত করে বানানো, যেন চালায় ঢাকা মস্ত মৌচাক। বারো ফুট ব্যাসার্ধ, পাঁচ ফুট খুঁটির ওপর বসানো; দোতলায় ওঠে বাঁশের মই ধরে। উলটো দিকে অগ্নিস্থালী। সবাই মেঝেয় বসে বা শোয়।

কম্বল হল একমাত্র হস্তশিল্পজাত দ্রব্য। ক্রমাগত সুপুরি চিবিয়ে চিবিয়ে তাদের দাঁতে কালো দাগ গেছে, তাতে লাল ছোপ। তাতে ভয়ানক দেখতে লাগে। কিছু শঙ্খের বদলে তাদের রুপোর আংটি নিলাম। ল্যাঙ্কুর নামে এক সর্দার আমার শালের রং-এ মুগ্ধ। সে শালটাকে শক্ত করে ধরে তিনটে মুরগি ঠ্যাঙ্গে বেঁধে আমার মুখের সামনে ধরতে লাগল—আই প্রেজেন্ট, ইউ প্রেজেন্ট। এক অফিসারের হস্তক্ষেপে লাঙ্কুরের আগ্রহ থেকে রক্ষা পেলাম।

দ্বীপে কোন বন্য জন্তু নেই। অসংখ্য শেয়াল কুমির ও কাঁকড়া আছে বলে শোনা গেল। নাবিকদের রাতে দ্বীপে থাকা নেটিভরা পছন্দ করে না। ফিরতে দেরি করায় নিকোবরিরা বল্লম নিয়ে হাজির হয়ে বলে দিল পরের দিন আসতে। বিদেশিদের সম্পর্কে আতঙ্কিত না হলেও ওরা খুব সতর্ক থাকে। রাত্রির বাতাস বিদেশীদের পক্ষে নিরাপদ নয়। জ্বর হয়।

অনেক স্যাভেজ ইউরোপীয় জ্যাকেটে সজ্জিত হয়ে চরম অহংকারে মট মট করতে করতে হাঁটছে। লাঙ্কুরের মাথায় একটা তেরচা টুপি। সবথেকে খাতির পাওয়া মহিলাটি সম্ভবত তাদের রানি। তার মাথায় একটা সুগার লোফের মতো দেখতে গোল টুপি, কাঁধে একটা ছোট্ট চারকোনা রুমাল বাঁধা, মাঙ্কি ম্যান্টেলের মতো দেখতে লাগছে। কোমরে জড়ানো একখণ্ড নীল কাপড়। রুপোর তারের নেকলেস, চুড়ি, পায়ের খাড়ু, হাতপায়ের আঙ্গুলে অজস্র আংটি।

নেটিভরা নারকোল গাছ থেকে জিনের মতো একরকম উত্তেজক পানীয় বানায়। প্রথমে গাছের ছালে একটা ফুটো করে, তারপর ফুটোর ঠিক নিচে বসানো নারকোলের মালায় রস সংগ্রহ করে। রস গেঁজে গিয়ে জোরালো পানীয়ে পরিণত হয়—ভারতের তাড়ি বা টোডি।

লাঙ্কুর আমার পাশে বসে আমার মুখের ওপর ধোঁয়া ছাড়তে লাগল সৌজন্যের নমুনা হিসেবে। ওরা তামাক নিয়ে পাতায় মুড়ে নেয়, তারপর সিগারেটের মতো ধূমপান করে। দ্বীপে আটকে পড়ার জন্য এইসব লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। উইনচেলসি—জাহাজে একশো কুড়ি জন অসুস্থ। নাবিকদের মধ্যে স্কার্ভি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

আমরা ৩০ অক্টোবর নেমে অনুকূল বাতাস পেয়ে ২ নভেম্বর দ্বীপ ত্যাগ করলাম। বাতাসহীন শান্ত অবস্থার বিপরীত মেজাজে ছিল সারা জাহাজ।

সংশয় ও ধোঁয়াশার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ স্কুল শিক্ষায় কী প্রভাব ফেলবে?

অভিজিৎ ঘোষ

২০১৪ সালে ৩১তম এন এস এস ও (NSSO) তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী ৬ কোটি ১৭ লক্ষ ছেলে-মেয়ে স্কুলশিক্ষা সম্পূর্ণ করার আগে স্কুলের আঙিনা থেকে বিদায় নিয়েছে। ২০১৮ সালের ৭৫তম সমীক্ষায় এই সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটির মতো। এই সংখ্যা দু'দুটো অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সমান। এই বিপুল সংখ্যক প্রতিভা আমাদের দেশ হারালো—যা বলা যেতে পারে 'মিসিং ট্যালেন্ট'। এর সাথেই শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ এবং বিভিন্ন সামাজিক বর্গের মধ্যে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির উপর নজর ছিল সারা দেশের। কিন্তু অতিমারির মধ্যে সংসদকে এড়িয়েই অনুমোদিত হয়ে গেল নয়া শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতির জন্য দেশ তিন দশকের বেশি সময় অপেক্ষা করে আছে। তাই যে আলাপ-আলোচনা, গণতান্ত্রিকপ্রক্রিয়া কাঙ্ক্ষিত ছিল তা হল না। এমনকী শিক্ষা যুগ্ম তালিকায় থাকা সত্ত্বেও রাজ্যগুলিকে এড়িয়ে তাড়াহুড়ো করেই পেশ করা হল শিক্ষানীতি। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে বর্তমান সরকার ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০১৫ সালে সুব্রমনিয়ম শিক্ষা কমিশন গঠন করে। কমিশন প্রতিবেদনও জমা দেয়। সেই প্রতিবেদন বাতিল করার পিছনে যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। কস্তুরিরঙ্গন কমিটি ৪৮৪ পাতার খসড়া শিক্ষানীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে ৬৬ পাতার দলিলে পরিণত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখার চেষ্টা করব এই শিক্ষানীতি স্কুলশিক্ষায় কী প্রভাব ফেলতে চলেছে।

তার আগে দেখে নেওয়া যাক এই শিক্ষানীতির তাত্ত্বিক ভিত্তিটি। শুরুতেই প্রতিবেদনে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সাথে দেশের শিক্ষা পরম্পরা, জাতীয়তাবাদ এই শব্দবন্ধের ব্যবহারে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এর পিছনে রয়েছে নাগপুরের প্রেসক্রিপশন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে প্রাচীন ভারতে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সীমিত ছিল সমাজের মুষ্টিমেয় অংশের মধ্যে। একবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন সভ্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সেই বৈষম্য ফিরিয়ে আনারই চেষ্টা করা হচ্ছে না কি? এর সাথেই যুক্ত করা হয়েছে— (1) Accessibility (2) Equity (3) Quality এই শব্দবন্ধগুলি। বলা হয়েছে 'Education Policy lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual'. এই ভিত্তির মধ্যেই স্ববিরোধী এবং আকর্ষণীয় শব্দের ব্যবহারে গুলিয়ে দেওয়ার একটা সচেতন প্রচেষ্টা চলছে। ফলে নতুন শিক্ষানীতি প্রত্যাশার জায়গায় সংশয় ও ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে।

ছেষট্টি পাতার প্রতিবেদনে প্রায় পঁচিশ পাতা জুড়ে স্কুলশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান স্কুলশিক্ষার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১০+২ এই ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে ৫+৩+৩+৪ কাঠামোর হবে নতুন স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রথম শ্রেণির আগে তিন বছরের প্রাক্-প্রাথমিকের কাঠামোয় শিশুদের আনা হবে। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যবস্থা শিশুর পূর্ণবিকাশে সাহায্য করবে। কিন্তু এর রূপায়ণের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তার ব্যবস্থা হবে কোথা থেকে? এই বিষয়ে শিক্ষানীতি নীরব। তিন বছরের প্রাক্-প্রাথমিকের রূপায়নের জন্য অঙ্গনওয়াড়ির কর্মীদের যুক্ত করা হবে এবং তাঁদের অন-লাইন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য বর্তমান ব্যবস্থা ১০০ শতাংশ শিশুকে গ্রহণ করতে পারবে তো? আসলে ঘুরপথে শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণের মাধ্যমে প্লে-স্কুল গড়ে উঠতে বাধ্য। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের আয়-কাঠামোর বিষয়েও এই নীতি নীরব। অথবা প্রাক্-প্রাথমিক কিংবা প্রাথমিকে যদি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা যুক্ত হন সেক্ষেত্রে নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা কী হবে সেই বিষয়েও এই দলিল কোনো সুনির্দিষ্ট দিশা দেখাতে পারেনি।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিটি এখানে মেনে নেওয়া হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণি, সম্ভব হলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সন্দেহের উদ্রেক হয় যখন ত্রিভাষা তত্ত্বের প্রস্তাব করা হয়। সমস্যা অধিক ভাষা শেখার ক্ষেত্রে নয়। সমস্যা কয়েকটি বিশেষ ভাষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া যা এই দেশের বহু ভাষার সংস্কৃতির পরিপন্থী। আসলে ঘুরিয়ে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। এরই সাথে সিলেবাস ঠিক করার মূল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে দেওয়া এই দেশের বহুত্ববাদী সমাজের মূলে কুঠারাঘাত, শিক্ষাকে কেন্দ্রীয়করণের চেষ্টা।

এই ব্যবস্থায় মাধ্যমিকের গুরুত্ব কমিয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি একসাথে সেকেন্ডারি শিক্ষা হিসাবে বিবেচিত হবে। এর ফলে অসংখ্য মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করতে হবে। পড়ুয়ারা বিভিন্ন বিষয় নিজেদের পছন্দমতো বেছে নিতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট শিক্ষক নিয়োগ ও বিপুল পরিকাঠামো গড়ে তোলা। কিন্তু অর্থের সংস্থান কীভাবে হবে সে-বিষয়ে এই নীতিতে কোনো পরিকল্পনার উল্লেখ নেই।

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের একটি তালিকাও এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে পড়ুয়াদের শ্রমের বাজারের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে অন্যদিকে পারিবারিক পেশা বেছে নিতে সুকৌশলে বাধ্য করবে যা প্রাচীন ভারতের অন্যতম নিদর্শন। এটি শিক্ষার অধিকার আইনেরও বিরোধী যেখানে ছয় থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা আছে।

নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করা স্কুলশিক্ষাকে জীবন্ত রাখার প্রাথমিক শর্ত। দলিলে বিষয়টি মেনে নেওয়া হয়েছে। সারা দেশেই বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ পড়ে রয়েছে। নীতি রূপায়ণের জন্য দ্রুততার সাথে এই পদ পূরণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বি.এডের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাব করা হয়েছে ৪ বছরের বি.এড কোর্সের। একজন পড়ুয়া প্রস্তাবিত চার বছরের স্নাতক স্তরের যে ক'বছর সম্পূর্ণ করবে সেই ক'টি বছর বি.এড কোর্স কম করতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি দু'বছর স্নাতকের পড়া সম্পূর্ণ করে তাহলে তাকে দু'বছরের বি.এড করতে হবে। এই ব্যবস্থা উদ্বেগজনক। স্নাতক স্তরের সিলেবাস আর বি.এডের সিলেবাসে কীভাবে সামঞ্জস্যবিধান হবে সে-বিষয়ে কোন দিশা নেই। প্রস্তাবিত নীতি ব্যাপক হারে বেসরকারি বি.এড কলেজ খুলতে উৎসাহিত করবে। আজ প্রশ্ন তোলার সময় হয়েছে শিক্ষকতা শুরুর আগেই কেন একজনকে এই কোর্স করতে হবে? এই কোর্স করলেই সকলের চাকরি নিশ্চিত তো? আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এটা বিলাসিতার নামান্তর। এর মানে এই নয় বি.এড কোর্সের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ আসলে একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। একজন শিক্ষকেরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন। এর সাথে স্কুল শিক্ষকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা উচিত। এই বিষয়টি শিক্ষানীতিতে উল্লেখ থাকলেও কীভাবে তা হবে তার উল্লেখ নেই। পদোন্নতির বিষয়টি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের নিরিখে করা প্রয়োজন যা শিক্ষকদের উৎসাহিত করবে ভালো ছাত্রদেরও উৎসাহিত করবে এই পেশায় যুক্ত থাকতে।

পার্শ্ব-শিক্ষকদের বিষয়টি নিয়ে এই দলিল আশ্চর্যরকম ভাবে নীরব। যদিও খসড়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল 'Stop the practice of para-teacher by 2022'। তাহলে এখন যাঁরা পার্শ্ব-শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? মনে রাখতে হবে এই শিক্ষকের সংখ্যা কম নয় এবং তাঁদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

এই স্বল্প পরিসরে শিক্ষানীতির সব দিক আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে চেষ্টা করা হল স্কুল শিক্ষা বিষয়ে এই নীতি কী প্রভাব বিস্তার করতে

—এরপর চারের পাতায়

ভেদিয়ায় বরকা হাঁসদার স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা ২৬ আগস্ট : প্রয়াত বরকা হাঁসদা সাংসারিক প্রতিকূলতার মধ্যেও যেভাবে খেতমজুর সংগঠনকে দিগরেডাঙ্গা, নরসিংহপুর, তালিম বাটি, ভেদিয়া, বনকুল প্রভৃতি অজয় নদীর ধারের গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সংগঠিত করেছিলেন সেই কথা মাথায় রেখেই আমাদের প্রতিটি কর্মীকে তাঁর সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কৃষক আন্দোলনের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে কৃষিজীবী প্রতিটি মানুষকে যে আরো ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই আন্দোলনে শামিল হতে হবে তার এই চেতনার কথা প্রতিটি খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। সাথে ২০২১-এর সাধারণ নির্বাচনের বড় লড়াইকে সম্মুখীন হয়ে আমাদের মাথা উঁচু করে থাকার জায়গা করে নিতে হবে, আমরা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারলেই প্রকৃতপক্ষে বরকা হাঁসদাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারব। বুধবার ভেদিয়া দিগরে ডাঙ্গায় বরকা হাঁসদার স্মরণসভায় স্মৃতিচারণায় একথা বলেন রাজেন্দ্র ধীবর, রবীন টুডু ও আলমগীর মণ্ডল প্রমুখ কৃষক নেতৃবৃন্দ। বরকা হাঁসদা গত ২৪ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬০ বছর বয়সে জীবনাবসান হয়। তিনি ভেদিয়া ৪ নম্বর শাখার সদস্য ছিলেন। আটের দশকে খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি পার্টিতে আসেন। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বহু আদিবাসী মানুষের উপস্থিতি ছিল এদিন লক্ষ্য করার মতো। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক নেতা সৌমিত্র চক্রবর্তী।

প্রবীণ কৃষক নেতা শঙ্কর ব্যানার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ আগস্ট : গলসী-২ এলাকার প্রবীণ কৃষক নেতা শঙ্কর ব্যানার্জী (৮৮)। তিনি ১৯৫৬ সালে অবিভক্ত পার্টির সদস্য পান। ওই সময় বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণ-বিরোধী আন্দোলন করার সময় ফুলশয্যার রাত্রেই তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তিনি ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলন ও ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে জমির আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালে কংগ্রেসী গুণ্ডারা কাশী তা'র নেতৃত্ব গ্রাম দখল করতে এলে তাঁর এবং সুবোধ ক্ষেত্রপাল, জীতেন পাকড়ে ও দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠলে তারা পিছু হটে পালাতে বাধ্য হয়। ১৯৭৩ সালে তাঁর নেতৃত্বে ওই এলাকায় মজুরি আন্দোলন গড়ে ওঠে। শঙ্কর ব্যানার্জী সিপিআই(এম) বুদবুদ গলসী জোনাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও জেলা কৃষকসভার প্রাক্তন কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। তাঁর ছিল সহজ সরল জীবনযাত্রা। তাঁকে এলাকার মানুষ ভালোবাসতেন এবং শঙ্কর ঠাকুর নামে ডাকতেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাসভবনে গিয়ে মরদেহে লাল পতাকা দেন কৃষকসভার সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। ভারপ্রাপ্ত এরিয়া কমিটির সম্পাদক জাফর আলি সহ অন্যান্য নেতবৃন্দ মরদেহে মাল্যদান করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার, জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, পার্টি নেতা গণেশ চৌধুরী, প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁদের পক্ষ হতেও মরদেহে মাল্যদান করা হয়। তাঁর এক পুত্র ও কন্যা বর্তমান।

৩০ আগস্ট ২০২০
স্বাস্থ্য বুলেটিন এক ঝলকে
কোভিড–১৯ আপডেট

আজ সর্বমোট স্যাম্পল পরীক্ষা	৪৩,৪৩৬
নতুন সংক্রমণ	৩,০১৯
আজ কোভিড মুক্ত	৩,৩০৮
রাজ্যে মৃত্যুর হার	১.৯৯%
রাজ্যে সুস্থতার হার	৮১.৯৫%
সর্বমোট কোভিড মুক্ত	১,৩০,৯৫২

আজকের দিনে রাজ্যে মোট কোভিড–১৯ পজিটিভ

হোম আইসোলেশনে	১৮,৩০৭
সেফ হোমে	১,৭১৩
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন	৫,৬৩৭

যে কোনও অনুসন্ধানের জন্য ফোন করুন ১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২ নম্বরে
এবং কোভিড চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে
১টাই নম্বরের ৩২টি লাইনে ২৪x৭ থাকছেন ৯৬ জন ডাক্তার।
ফোন করুন ০৩৩ ২৩৫৭ ৬০০১ (Direct) নম্বরে।
সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

খেতমজুর নেতা বিভূতি মুর্মূ প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২৬ আগস্ট : ভুঁড়ি অঞ্চলের হলদি ডাঙ্গার সিপিআই(এম) দরদী পূর্বতন খেতমজুর আন্দোলনের নেতা বিভূতি মুর্মূ (৭৫) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন দুই পুত্র, পুত্রবধূ নাতি-নাতনিদের। ২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তৃণমূলের গুণ্ডা বাহিনী গোটা পরিবারের উপর নামিয়ে আনে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। তবুও গোটা পরিবার মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করেই লালঝাণ্ডার পাশেই আছেন। প্রয়াত বিভূতি মুর্মু সিপিআই(এম) সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। ২০১৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে এই গ্রামেরই মদন সরেন তৃণমূলের ঘাতকবাহিনীর হাতে নৃশংস খুন হন। বর্তমানে ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলনের একজন সংগঠক ছিলেন। মৃত্যুর খবর শুনে এরিয়া কমিটির সদস্য মোস্তাক হোসেন, নাড়ুগোপাল যশ, সুকুমার দাস, সেখ আতিয়ার, পুষ্প দে ও অসংখ্য কর্মী তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান। উপস্থিত নেতৃত্ব মরদেহে পার্টির পতাকা দিয়ে ঢেকে দেন ও শ্রদ্ধা জানান। মৃত্যুর খবর শুনে গভীর শোক প্রকাশ করেন জেলা কৃষকসভার সম্পাদক সৈয়দ হোসেন ও খেতমজুর আন্দোলনের নেতা সাইদুল হক, কাজী জাফর আলী।

সিপিআই(এম) কর্মী বলরাম মণ্ডল প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২৫ আগস্ট : গলসী শিরোরাই অঞ্চলের রামনগর-এর সিপিআই(এম) কর্মী বলরাম মণ্ডল (৬৭) প্রয়াত হয়েছেন। তিনি এলাকায় বালিঘাটের শ্রমিক ছিলেন এবং সিআইটিইউ পতাকাতলে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ করতেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এলাকার সিপিআই(এম)-এর শাখা সম্পাদক ছিলেন। সাইদুল হক ও কমল সরকার দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

অখুশি এলাকাবাসী

—প্রথম পাতার পর

কালিনগরের মতোই হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই বিশ্বাস এলাকার প্রাক্তন বাম বিধায়ক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা রতন দাসেরও। তিনি বলেন, এলাকার মানুষের ভিটেমাটি ও রেললাইন রক্ষার্থে জালুইডাঙ্গায় পাকাপাকিভাবে নদী ভাঙন রোধের কাজ করা হোক।

জেলার মহিলারা

—প্রথম পাতার পর

এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দুটি ওয়ার্ডে স্যানিটাইজিং করা হয় ও ১০০ জন কে মাস্ক বিলি করা হয়। সংগঠনের বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটির পক্ষে প্রতিবাদ সভা হয়। পূর্বস্থলী আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে পূর্বস্থলী স্টেশন বাজারে প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, আলেয়া বেগম, ঝুমা দত্ত। সভাপতিত্ব করেন বাসন্তী কুরি।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন বনাম শ্রেণিগত ঐক্য

—দুয়ের পাতার পর

পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিত থেকে উদ্ভূত বলে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটিকে ভারতের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত মনে করেন না। ভারতীয় 'ইন্ডিয়ম'-এ রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের বদলে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতার উপরই সমস্যাটিকে ছেড়ে দিতে চান। সহনশীলতার এই বাণী নতুন নয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাছে এই স্বতঃস্ফূর্ততা প্রত্যাশা করা অর্থহীন। ভারতের ইতিহাস তা হলে অন্য কথা বলতো।

সম্প্রদায়িকতা হল সংকটগ্রস্ত শাসকশ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদের সর্বোত্তম বিভেদের হাতিয়ার—জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং শ্রেণি-সংবদ্ধতা ও শ্রেণি-সংগ্রামকে বিপর্যস্ত করার লক্ষ্যে এক ভয়ংকর রণকৌশল। যে ধর্ম-সম্প্রদায়কে অবলম্বন করেই সাম্রদায়িকতা গড়ে উঠুক না কেন, সর্বদাই তারা একে অপরের পরিপূরক। একে অপরকে বাড়িয়ে তোলে। তবে সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতা বিপুল সংখ্যাগুরুত্বের কারণেই সর্বদা সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হলে তা ধর্মের প্রতি রাজনৈতিক আচরণ করে ও রাজনীতির প্রতি ধর্মীয় আচরণ করে; ফলে তা রাজনীতি ও ধর্ম উভয়েরই মর্যাদাহানি ঘটায়। ভারতীয় পরিস্থিতিতে হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্বকে এক করে হিন্দুরাষ্ট্রের শ্লোগান ফ্যাসিবাদী সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ডাক ছাড়া আর কিছুই নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেলে তা যে কী ভয়ংকর ফ্যাসিবাদী চেহারা নিতে পারে ক্রমাগত তার লক্ষণ প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে ভারতের বর্তমান হিন্দুত্ববাদী শাসকদল বিজেপি ও তার সাম্প্রদায়িক ভিত্তি সংঘ পরিবারের বিপজ্জনক ও হিংসাত্মক কর্মধারায়। সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতাও যে সবসময় আত্মরক্ষামূলক থাকে তা নয়, প্রতিস্পর্ধী রূপ নেয়, জঙ্গি রূপও পরিগ্রহ করে, যার সাধারণ প্রবণতা বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে। ফলে বিপরীত প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতা আরও উগ্র হয়ে ওঠবার সুযোগ করে নেয়। ভারতের বর্তমান বিজেপি সরকার বিশ্বায়নের সওয়ার হয়ে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তারই সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক আজ গণতন্ত্রের পতাকাবাহক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই তাই চূড়ান্ত অর্থে তার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য উৎসমূলের বিরুদ্ধে এবং একই সঙ্গে উপরিকাঠামোর সর্বস্তরে বিস্তৃত লড়াই। সামন্ততন্ত্র, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের লড়াই-এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই সাম্প্রদায়িকতা ও তার ফ্যাসিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে সমস্ত শুভশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই লড়াই চালাতে হবে। সমাজক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে দূরত্ব ও অসহিষ্ণুতা এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে ব্যবধানগুলি যত কমিয়ে আনা যাবে, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সম্ভাবনাও তত কমবে। বৃহত্তর এক বিশ্ববোধ ও ধারাবাহিক শ্রেণি-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ বোধ ও বিভেদকে অবলুপ্ত করা সম্ভব হবে। ভারত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। এই বহুজাতিক বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আহত না করে শ্রেণিগতভাবে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস জোরদার করতে পারলেই সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও বিভেদবোধ পরাস্ত হবে। একই শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় বর্গের মানুষ পাশাপাশি অবস্থান করে। শ্রেণিগত বিচারে তাদের স্বার্থ এক ও পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলক— যেমন হিন্দু শ্রমিক ও মুসলমান শ্রমিকের স্বার্থ এক এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলক। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিচারে তাদের স্বার্থ ভিন্ন ও পারস্পরিক সম্পর্ক শত্রুতামূলক। একমাত্র শ্রেণিগতভাবেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশ হয়ে উঠতে পারে। সম্প্রদায়িকতার পথ তাই ভ্রান্ত পথ, সঠিক লক্ষ্য অর্জনের সঠিক পথ থেকে তা মানুষকে বিচ্যুত করে। তা শ্রেণিসংগ্রামকে বিপথগামী ও বিপর্যস্ত করে কার্যত শোষক শ্রেণির স্বার্থ ও স্থিতাবস্থাকে রক্ষা করে। ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষকে শ্রেণি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ও শ্রেণির জন্য শ্রেণিতে পরিণত ক'রেই একমাত্র শোষণ-মুক্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব।

স্কুল শিক্ষায় কী প্রভাব ফেলবে?

—তিনের পাতার পর

চলেছে সেই বিষয়ে। শিক্ষানীতির একদম শেষে জিডিপির ৬ শতাংশ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। এই দাবি পুরানো। এই অতিমারির সময়ে মোট জিডিপির পরিমাণ কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেখানে ৬ শতাংশ খরচ আদৌ যথেষ্ট কিনা প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। রাজ্যগুলির ভূমিকাই বা এক্ষেত্রে কী হবে তারও সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব নেই। তাই আশঙ্কা এই নীতি শিক্ষায় বৈষম্যকে বৃদ্ধি করবে। ডিজিটালাইজেশনের মধ্যেও লুকিয়ে আছে বৈষম্যের উপাদান। তাই আগামীদিন স্কুলছুট ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। প্রয়োজন ছিল শিক্ষার অধিকার আইনের উপরের ও নীচের দিকে সম্প্রসারণ করে সমগ্র স্কুলব্যবস্থাকে এর আওতায় নিয়ে আসা।

সব মিলিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সংশয় ও ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে। অথচ একটি দেশের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার আগামী অভিমুখ ঠিক করা, একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের ইস্তেহার রূপায়ণ করা নয়। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে না মেনেই অগণতান্ত্রিক উপায়ে এই নীতি রূপায়িত হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ইতিমধ্যে জানিয়েছেন খুব দ্রুত এই নীতি রূপায়ণ করা হবে। তাই প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। প্রয়োজন জনমতকে সচেতন ও সংগঠিত করা। এই নীতিকে যদি বদল বা বাতিল করতে হয় তাহলে রাস্তায় নামা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই। **লেখক : অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ইন্সটিটিউট অব সোসাল সায়েন্স, পাটনা এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর**

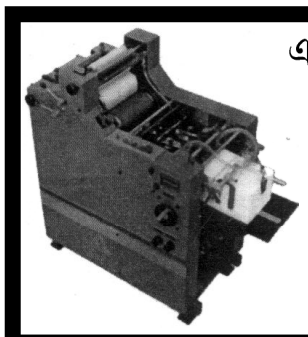
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
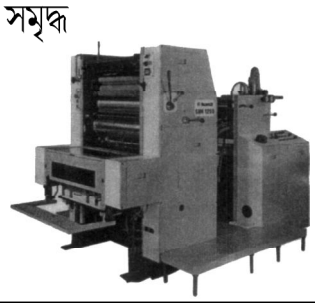
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা